আদালতে ছয় মনীষী

বারিদবরণ ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

লোকে যে কেন পিরামিডের ভেতর যত রহস্যের সন্ধান পায় কে জানে? সত্যি বটে তার মধ্যে তুতেনখামেন আছেন, আছেন নেফারতিতি, আছে মমির মমতা; আছে অজস্র রত্নরাজির বিপুল সম্ভার—তার অভ্যন্তরে ভিতরের মহলে। বাইরের ওই ত্রিকোণ পাহাড়ের বিশালতা—তাও তো কম ভীষণ সুন্দর নয়।

বাংলার উনিশ শতককে আমার ওই পিরামিডের মতোই মনে হয়—অমনি শতবর্ষব্যাপী বিশালতা, অমনি রাজকীয় মহার্ঘ্যতা, আর তার নীচে মমির বিপুল শয়ান। তেমনি মণিমুক্তারত্ন খচিত মণিকুট্টিম। এটা দেখতে শিখলে আর পাড়ি দিতে যেতে হয় না মিশর মুলুকে। এখানেই সব মিশে আছে, মিলে আছে। সেই রত্নগুহায় প্রবেশ করে আমরা থমকে যাই। তারই কতক কতক রতনের রাজি নিয়ে এসেছি সেই মাতৃকোষ থেকে। এই রত্নগুলো আমার মনে হয়েছে—মুক্তো। স্বাতী নক্ষত্রের জলে এদের জন্ম কিনা জানি না, কিন্তু ঝিনুকের নরম বুকে বালুকণার বেধন এবং বেদন অসহ যন্ত্রণার জারকে শুক্তির জন্ম—সে তো সত্য সূর্যসম।

উনিশ শতকে যে প্রাপ্তি নিয়ে আমাদের গরিমা এবং অহংকার—তা তো এইসব যন্ত্রণার স্বজন। সেই সব অন্তরালবর্তী যাতনার কিছু ইতিকথা এখানে এনে হাজির করেছি মনীষী-জীবন-মঞ্জুষা থেকে। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ—উনিশ শতকের সেই শ্রেষ্ঠ ছয় মনীষীকে আমি উদাহরণরত্ন হিসেবে বেছে নিয়েছি। এঁরা যন্ত্রণা ভোগ করেছেন ঘরে বাইরে। এঁদের মর্যাদা বার বার অসম্মানের স্পর্শ পেয়েছে আদালতের কাঠগড়ায়। এই অসম্মান এসেছে কখনও পরিবারের অভ্যন্তর থেকে, কখনও বা বাইরের ষড়যন্ত্রে। যাঁদের আমরা আত্মীয় বলি—তাঁদের সঙ্গে আত্মার যোগ কেমন করে থাকে জানি না। রক্তের সম্পর্কের বাধ্যতা কোথায়—তাও খুঁজে পাই না। আত্মীয়রা অনেক ক্ষেত্রেই স্বজন হয়ে উঠতে পারেন না। সুজন তো নয়ই—বিশেষ করে যদি সেই সম্পর্কে বিষয় সম্পত্তি নামে একটা বিষের জ্বালা থেকে যায়। ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়—সাধে কি বলে?

ঘটনাচক্রে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ (বলা ভালো নরেন্দ্রনাথ) হয় পরিবারসূত্রে, না হয় স্বোপার্জিত ধনে ধনবান হয়ে উঠেছিলেন। আর তাতেই আত্মীয়দের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন। তাই রামমোহনের বিরুদ্ধে মামলায় শামিল হন ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্বয়ং মা। বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা-অপমৃত্যু ঘটে পুত্রের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্রকে বঞ্চনা করেন পিতা এবং অসূয়াগ্রস্ত অগ্রজ। মধুসূদন শিকার হন আত্মীয়দের কপটতার। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মামলা করেন সহোদরা বর্ণকুমারী।

বিবেকানন্দকে বার বার আদালতে ছুটতে হয় আত্মীয়র বিরুদ্ধে মায়ের হক প্রতিষ্ঠার জন্য। এর বাইরেও রামমোহনকে রাজরোষে পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথকে প্রজাকল্প ব্যক্তির।

যে সন্তানদের নিয়ে বাঙালির গর্বের অবধিমাত্র নেই, সেই সন্তানদের নীচে টেনে আনার যে আইনি লড়াইগুলো ঘটেছিল—এঁদেরকে ঘিরে—তাঁরই একটা তথ্যভিত্তিক, কৌতূহলোদ্দীপক ছবি এখানে আঁকতে চেষ্টা করেছি সাদামাটা তুলি আর রং দিয়ে। আমার আঁকার বাহাদুরিতে বিন্দুমাত্র নয়, আপন দ্যুতিতে তাঁরা দ্যুতিময় হয়ে উঠেছেন এই গভীর যন্ত্রণার মধ্যেও। পরিবার এবং পারিপার্শ্বিক যত পেরেছে পঙ্ক সঞ্চয় করেছে। কিন্তু তাঁরই মধ্যে এঁরা ফুটে উঠেছেন পঙ্কজের শুভ্রতা আর সুবাসে। এঁরা সূর্যতাপস—এঁদের তপস্যা সূর্যের কারণে।

এই রচনাটি 'বর্তমান' শারদীয়া সংখ্যায় পত্রস্থ হবার পর বহুজনে আমাকে অভিনন্দিত করেছেন। সবচেয়ে নন্দিত হয়েছিলাম, যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের জনৈকা আত্মীয়া আমাকে ফোন করে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারগণ আমার কাছে কৃতজ্ঞ—কারণ এই প্রবন্ধের সাবুদে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের নৈহাটির বাড়ির যথাযথ সম্মানরক্ষায় কৃতকার্য হয়েছেন। আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

অভিভূত হয়েছিলাম সন্দীপের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াতেও। যে মুহূর্তে সে এই রচনাটির বিষয়বস্তু জেনেছে, সেই মুহূর্তেই বইটি প্রকাশের জন্যে সে তৎপর হয়ে উঠেছে। আজকাল এটা দুর্লভ ব্যাপার। তবে প্রাতিপাদিক অনুকূল প্রতিক্রিয়াটি প্রকাশ করে এবং তারপর থেকে বই আকারে প্রকাশের জন্য নিত্য তাগিদ দিয়ে গেছেন আমার শুভানুধ্যায়ী চক্রবর্তী-দম্পতি—কাকলি ও কৃষ্ণরূপ।

জানুয়ারি, ২০০৯ — বারিদবরণ ঘোষ

কলকাতা

সূচিপত্র

রামমোহন রায় : ১১

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ৭০

মধুসূদন দত্ত : ৮৩

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ৯৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ১০৫

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) : ১১৮

রাজা রামমোহন রায়

'ভারতপথিক' রামমোহন রায় অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বাড়িতে দেববিগ্রহের নিত্যপূজা। তার জন্যে আলাদা সম্পত্তি বরাদ্দ। দেবদ্বিজে সবার ভক্তি। কিন্তু ব্যতিক্রম হয়ে উঠলেন বংশের একটি ছেলে—রাধানগরের রামকান্ত রায়ের মেজো ছেলে রামমোহন। বড়দা জগমোহন এবং ছোটোভাই রামলোচন।

পৈতৃক ভদ্রাসন রাধানগর ছেড়ে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে রামকান্ত লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে নতুন বাড়ি তৈরি করিয়ে সপরিবারে উঠে আসেন। যদিও রাধানগরের ভদ্রাসনের অংশ তিনি ছাড়েননি। রামকান্তের তিন সংসার। প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রা নিঃসন্তান। দ্বিতীয়া স্ত্রী তারিণীদেবী প্রথম দুটি সন্তানের জননী। তৃতীয়া রামমণির পুত্র হলেন রামলোচন। রামমোহন অন্তত তাঁর চৌদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত রাধানগরের বাড়িতেই কাটান। যৌথ পরিবারে সকলেই ভালোভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন।

১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে রামকান্ত একটা কাণ্ড করে বসলেন। এই বছরের ১ ডিসেম্বর (১৯ অগ্রহায়ণ, ১২০৩ বঙ্গাব্দ) তিনি একটি দানপত্র করে পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন নিজের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ রেখে দিয়ে। তিন পুত্রই এই দলিলে স্বীকারপত্র লিখে দিলেন এবং খানাকুল-কৃষ্ণনগরের জনৈক কাজির কাছে সেটিকে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেওয়া হল। কাউকে কোনো নগদ পয়সাকড়ি তিনি দিলেন না। আগে অস্থাবর যাকে যা দেওয়া হয়েছে—তা তাদেরই থাকবে। কেউ কারও সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে পারবেন না। তাঁর আর্থিক দায়ও কাউকে বইতে হবে না। বর্ধমানে তিনি যে বাড়ি করিয়েছিলেন—সেটা রামকান্তের নিজেরই থাকবে। এমনকী বাড়ির দেববিগ্রহও কারও গলগ্রহ হবেন না, এঁরা তাঁরই থাকবে। এঁদের দাদুরা যেসব ধনসম্পত্তি দিয়েছেন তাও তাঁদের নিজেদের থাকবে। তারিণীদেবী ও রামমণিদেবী নিজেদের নামে যে সম্পত্তি কিনেছেন—তা তাঁদেরই থাকবে। তিন পুত্র প্রত্যেকেই নিজেদের নাম উল্লেখ করে—'আমি শ্রী..... রায় বসতবাটী প্রভৃতি যাহা আমাকে দেওয়া হইল তাহা গ্রহণ করিলাম ও এই বাটোয়ারা অনুযায়ী দখল ও ভোগ করিব; যদি অন্য কাহারও নামে লিখিত জমিজমাতে দাবি করি বা কেহ করে তবে তাহা মিথ্যা'—এই শপথবাক্য লিখে তার নীচে সই করে দিলেন।

এর ফলে রামমোহনের ভাগে পড়ল :

- বসতবাটি ও বেড়, চৌহদ্দিযুক্ত গাছ প্রভৃতিসহ এবং খিড়কির দরজার দিকের পুকুর, নতুন পুকুর এসবের অর্ধেক.....১ দফা
- গোয়ালবাড়ি ও বেড়, গাছসহ চৌহদ্দিযুক্ত বাড়ি.....৮ বিঘা খ. মৌজা কৃষ্ণনগর :

সূর্যদাস রায়ের বেড় ধানের জমি.....৯ বিঘা

- গ. কোঠালিয়ার কুণ্ডের ধানের জমি .....৩ বিঘা
- ঘ. পরগনা চন্দ্রকোণায় পুরোনো চক.....৭ বিঘা।
- ঙ. মৌজা কাট্যাদলে পৈতৃক বেড়ে রামকান্তর অংশ.....১ দফা
- চ. মৌজা কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে রামকৃষ্ণ শেঠ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে কেনা বাড়ি ও পুকুর। চৌহদ্দিযুক্ত.....১ দফা।
- ছ. গোপীনাথপুরে পৈতৃক পুকুরে নিজ অংশ.....১ দফা।

এছাড়া লাঙ্গুলপাড়ার নতুন বাড়ি সমানভাবে প্রথম দুই পুত্রের ভাগে পড়ল। রামলোচন পেলেন রাধানগরের ভদ্রাসন। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িটি কেবল রামমোহনই পেলেন—তখনকার দিনে এর দাম ছিল প্রায় তিন হাজার টাকা। রামলোচন অতএব লাঙ্গুলপাড়া ছেড়ে মাকে নিয়ে রাধানগরে চলে গেলেন। রামকান্ত বর্ধমান-রাজ তেজচন্দ্রের মা মহারানি বিষ্ণুকুমারীর বিষয়সম্পত্তি দেখতে গেলেন তাঁর মোক্তার হিসেবে—বর্ধমানেই বেশি থাকতেন তিনি। ছেলেরা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসতেন। তবে তাঁদের মায়েরা কোনওদিন বর্ধমান গিয়ে থাকেননি। তারিণীদেবীই মোটামুটি বাড়ির কর্ত্রী হয়ে সংসার চালাতে লাগলেন পুত্র, পুত্রবধূ, দৌহিত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে।

এর পরে রামমোহন নিজের উপার্জন থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই বর্ধমানে গঙ্গাধর ঘোষ ও রামতনু রায়ের কাছ থেকে ৩১০০ ও ১২৫০ টাকায় গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর নামে দুটো তালুক একই দিনে নিজের নামে কিনে আপন সম্পত্তি বাড়িয়ে নিলেন। তাঁর মোট সম্পত্তির আয় থেকে প্রায় বাইশ হাজার টাকা বাৎসরিক আদায়-খরচ ও সদর-জমা দিয়েও বছরে ৫-৬ হাজার টাকা আয় হত।

ঠিক এর আগের বছরেই রামকান্ত বাকি খাজনা অনাদায়ের কারণে এবং জগমোহনও একই অপরাধে জেলে যান। সেসব অন্য কথা। তবে রামমোহন এসব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত রইলেন। পরে জন ডিগবির অধীনে কাজ করার সময় ভালো উপার্জনের কারণে আরও সম্পত্তি, ঘরবাড়ি বাড়ালেন। জাহানাবাদ পরগনার বীরলুক ও কৃষ্ণনগর এবং ভুরসুট পরগনার শ্রীরামপুর নামে তিনটি তালুক কিনে ফেলেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রি করে তিনি কলকাতার চৌরঙ্গিতে ২০৩১৭ টাকা দিয়ে এলিজাবেথ ফেনউইক নামের এক মেমের কাছ থেকে দোতলা এবং ১৩০০০ টাকা দিয়ে ফ্রান্সিস মেন্ডেস সাহেবের কাছ থেকে ৮৫ আমহার্স্ট স্ট্রিটের বিশাল ম্যানসনটি (১১ বিঘার ওপর) কিনে ফেলেন।

সম্পত্তি বাড়ানোর পর লাঙ্গুলপাড়ার বাড়িটি তিনি ভাগনে গুরুদাসকে বিনা শর্তেই দান করেন। লাঙ্গুলপাড়া ছেড়ে তিনি নিকটবর্তী রঘুনাথপুরে একটি নতুন বাড়ি তৈরি করাতে লাগলেন—সম্ভবত ঠাকুরসেবা বা অন্য কারণে মায়ের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না বলে বাড়িটি সম্পূর্ণ হবার আগেই তিনি ২৮ জানুয়ারি ১৮১৭ তারিখে (বাংলা ১২২৩

বঙ্গাব্দের ১৭ মাঘ) পরিবারসহ (রামমোহনের তিনটি বিয়ে—প্রথমজনের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর ন' বছর বয়সে—তিনি বেশিদিন বাঁচেননি, দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী। তাঁরই বড়োছেলে রাধাপ্রসাদ। তৃতীয়া পত্নী উমাদেবী) চলে আসেন। পরে কলকাতায় এসে অচিরে তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁর আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে বিখ্যাতদের আনাগোনা ছিল, বিদেশিরাও এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে যেতেন এই 'সিমলা হাউসে'।

ওদিকে রামমোহনের বড়দা জগমোহন ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে মারা যান খুবই দরিদ্র অবস্থায় (তাঁর স্ত্রীর সংখ্যাও ছিল তিন) পুত্র গোবিন্দপ্রসাদকে রেখে। বাবা রামকান্ত মারা যাবার পর তাঁর শ্রাদ্ধ, বাড়ির দেবসেবা ইত্যাদি নিয়ে মা তারিণীদেবীর সঙ্গে রামমোহনের দূরত্ব বাড়তেই থাকল। তারিণীদেবীর কাছের মানুষ এখন তাঁর এই পুত্র নন, বড়োছেলে জগমোহনের পুত্র, তাঁর আদরের নাতি গোবিন্দ প্রসাদ। তার পরিণাম ভালো হয়নি তা আমরা পরে দেখব। ১৮১৫ সালের শেষের দিকে রামমোহন পুরোপুরি কলকাতার বাসিন্দা। বয়েস চল্লিশ পার হয়ে গেছে—গৌরকান্তি, দীর্ঘকায়, প্রতিভাদীপ্ত নয়ন, প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর। এ সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্কুর আত্মীয়সভা স্থাপন করেছেন, বহু-ঈশ্বরবাদ পরিত্যাগ করে একেশ্বরবাদী হয়ে পড়েছেন এবং মূর্তিপূজা পরিহার করেছেন। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি। হিন্দুসমাজে প্রবল নিন্দিত, তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা পর্যন্ত হচ্ছে। বিপুল বিদ্যা, প্রচণ্ড কর্ম-উদ্দীপনা, পশ্চিম সভ্যতার আলো পড়েছে তাঁর ওপর।

কিন্তু শুধু বাইরে নয়, পরিবারেও তাঁর কোনো শান্তি নেই। সেখানেও তিনি ঘৃণিত, অবাঞ্ছিত। ঠাকুরের কাছে মাথা নত করছেন না তাঁর পুত্র—এ দেখে মা তারিণীদেবী হতবাক। রামমোহন মায়ের চাপে ঠাকুর প্রণাম করে নাকি বলেছিলেন, আমি কূলদেবতাকে প্রণাম করিনি—মায়ের ঠাকুরকে প্রণাম করেছি মাত্র। ঠাকুরপুজোর জন্য টাকাপয়সা পর্যন্ত দেন না। চাপাচাপি করলে মাকে বলেছিলেন, টাকা দিচ্ছি বটে, তবে পুজোর জন্যে নয়, গরিবদের দান করবে বলে।

ফলে যা ঘটার ঘটে গেল। ১৮১৭ সালের ২৩ জুন কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের ইকুইটি ডিভিশনে রামমোহনের নামে একটি মামলা রুজু করে দিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ। বলা বাহুল্য, পিছনে উসকানি ছিল ঠাকুমা তারিণীদেবীর। অর্থাৎ রামমোহন জননীর।

অথচ, বাবা রামকান্তের জেল হলে তাঁকে ছাড়াবার জন্যে জগমোহনকে ১০০০ টাকা দিতে হলে সে টাকা কিন্তু রামমোহনই দিয়েছিলেন।

গোবিন্দপ্রসাদের কতই বা বয়স তখন—বড়োজোর উনিশ কি কুড়ি! হায় অনভিজ্ঞ যুবক। তাঁর বক্তব্য হল—রামমোহন যেসব বিষয়সম্পত্তি ভোগদখল করছিলেন তা রামমোহনের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারেররই সম্পত্তি। এতে তাঁর বাবা জগমোহনেরও সমান অংশ। অতএব বাবার অবর্তমানে এই স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির অর্ধেক তাঁরই পাওনা। তাঁর যুক্তি ছিল রামকান্ত যখন দানপত্র করে তিন পুত্রকে সম্পত্তি ভাগ

করে দেন, তারপরে রামলোচন নিজে আলাদা হয়ে চলে গেলেও জগমোহন ও রামমোহন বাবার সঙ্গে একত্র হয়ে যৌথ পরিবারে বাস করতে থাকেন একান্নবর্তী হয়ে ১৮০৩-এ রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হওয়া অবধি। তাঁর মৃত্যুর পরেও জগমোহন রামমোহন একান্নবর্তী ছিলেন ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে জগমোহনের মৃত্যু পর্যন্ত। আর ১৮১৭ সালের ২৭ জানুয়ারি রামমোহন রঘুনাথপুরের নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়া পর্যন্ত গোবিন্দপ্রসাদও কাকার সঙ্গে একত্রে ছিলেন। এরপর থেকেই নাকি রামমোহন তাঁকে ঠকাতে আরম্ভ করেন তাঁর অংশ থেকে বঞ্চিত করে। অতএব, আদালত যেন কমিশনার মারফত সব তদন্ত করে তাঁর অর্ধেক অংশ দেবার ব্যবস্থা করে।

মামলাটি খুবই জটিল এবং বিপুল খরচসাপেক্ষ। সবে তাঁর নাবালকত্ব ঘুচেছে, ১৯-২০ বছরের প্রায় উপার্জনহীন একটি তরুণ কী করে এই বিশাল ঝুঁকিটি মাথায় নিলেন? আগেই বলেছি, তারিণীদেবী এর পেছনে থেকে কলকাঠিটি নাড়ছিলেন। তিনিই আর্থিক ভরসাও দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই, তবে কার্যক্ষেত্রে পিঠ দেখিয়েছিলেন। আসলে ছেলের আচার-আচরণ দেখে রক্ষণশীলা এই মহিলা যেন একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। একবার তিনি কলকাতায় এসে ছেলের কাছে হাজির হয়েছিলেন দেবসেবার জন্যে দেবোত্তর জমির বন্দোবস্ত করাতে। ছেলে মুখের উপর বলে দিলে : না, দেব না! শাপমন্যি দিতে বাকি রাখেননি তারিণীদেবী। সেটা জানতে পারি : পরোক্ষভাবে যখন মামলায় বিবাদী রামমোহন অনুপস্থিত তারিণীদেবীর উদ্দেশে কতকগুলো প্রশ্ন রেখেছিলেন। আগেই সেগুলো শুনিয়ে দিই : *আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্মমতের জন্য তাহার সহিত আপনার কি বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই, এবং আপনি যেভাবে হিন্দুধর্মের পূজা-অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ার প্রতিশোধস্বরূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে মকদ্দমা করিতে প্ররোচিত করেন নাই? আপনি, বাদী এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলি ও ধর্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই? আপন কি বারবার বলেন নাই যে, আপনি রামমোহনের সর্বনাশসাধন করিতে চান, এবং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে, ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্বনাশসাধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি কি সর্বসমক্ষে বলেন নাই, যে হিন্দু প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে, তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই?.....এই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতাস্থ সিমলার বাড়িতে আসিয়া কি বিগ্রহসেবার জন্য কিছু জমি চান নাই?* ব্যাস, মামলার নেপথ্য লোকটি আর কারও অগোচরে রইল না। তবুও বলি, মাঝখানে তারিণীদেবী যে মামলা মিটমাটের চেষ্টা করেননি, এমন নয়।

এজলাসে মামলা উঠলে রামমোহন তাঁর বাবার দানপত্র কাজির কাছে রেজিস্ট্রি করে নেওয়া হয়েছিল তা স্বীকার করেন। তিনি এও মেনে নেন যে, মায়ের অধীনেই তাঁরা লাঙ্গুলপাড়ায় একত্র বাস করতেন—কিন্তু তাঁরা দুই ভাই-ই সংসারের যাবতীয় খরচখরচা বহন করতেন। কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে তাঁরা পৃথকই ছিলেন।

মামলা রুজু করার ছ'মাস পরে ২৭ জানুয়ারি, ১৮১৮ তারিখে এজলাসে মামলা উঠল আর ১২ ফেব্রুয়ারি সাত সাক্ষীর জবানবন্দি নেবার জন্য শপথবাক্যও পাঠ করানো হল। রামমোহনের বিপক্ষে দুজন সাক্ষী বেচারাম সেন ও কৃষ্ণমোহন ধারা জবানবন্দি দিলেন ৫ মার্চ। চাপানউতোর চলতেই থাকল। বেচারাম, প্রধান সাক্ষী, একটানা আট বছর রামমোহনের অধীনে চাকরি করার পর বরখাস্ত হলে গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষ নেন। মানুষের ধর্ম! কিন্তু গোবিন্দ প্রসাদের পক্ষে আর কেউ সাক্ষী দিলেন না। বেচারা! বারবার তিনবার তিনি সময়ভিক্ষা করতে লাগলেন সাক্ষী এনে দেবেন বলে। কিন্তু কোনোবারই পারলেন না। শেষ অবধি ৩১ আগস্ট আর ১ সেপ্টেম্বর তিনজন সাক্ষীকে কোনোপ্রকারে হাজির করলেন—কিন্তু কেউই তাঁদের পরিবারের সম্পত্তি ভাগ বা অবস্থান সম্পর্কে ভেতরের কোনো কথা বলতে পারলেন না। তখন আরও ১৫ দিন সময় নিলেন গোবিন্দপ্রসাদ তারিণীদেবীকে আনবেন কথা দিয়ে। আর বললেন, তিনি দেউলিয়া, তাঁকে বিনা পয়সায় মামলা চালাতে দেওয়া হোক।

এবারে রামমোহন ২৩ সেপ্টেম্বর একটি এফিডেভিট জমা দিলেন—সাতজন সাক্ষীর কথা বলে। আদালত জানালেন যে গোবিন্দপ্রসাদকে দেউলিয়া বা দরিদ্র বলে ঘোষণা করা যাবে না। কারণ তিনি তাঁর পক্ষে কোনো কাগজপত্র দাখিল করতে পারেননি। এবারে রামমোহন সব কথা জানালেন। তারিণীদেবীর উদ্দেশে একপ্রস্থ প্রশ্নবাণ হাজির করলেন। তিনি যে পৃথক এবং স্বোপার্জিত ধনে সম্পত্তি বাড়িয়েছেন—তারও প্রমাণ দিলেন। প্রায় তিন বছর মামলা চলার পর ১০ ডিসেম্বর, ১৮১৯ তারিখে বিচারক তাঁর রায় ঘোষণা করলেন। বাদীর পক্ষে কেউ নেই।

সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতি রায়ের কাগজে সই করলেন—প্রধান বিচারপতি মান্যবর স্যার হাইড ইস্ট, মাননীয় স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকানাঘটেন এবং মান্যবর স্যার অ্যান্টনি বুলার।

এই ঘটনায় তারিণীদেবী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাঙ্গুলপাড়া ছেড়ে একাই পুরী চলে যান এবং জগন্নাথ মন্দির ঝাঁট দিয়ে ভিক্ষা করে জীবন কাটাতে থাকেন। বছর দুয়েক পরে ২১ এপ্রিল, ১৮২২ তারিখে সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

এতদিনে গোবিন্দপ্রসাদ বুঝতে পারলেন কী গভীর অন্যায় ও অবিবেচনা তিনি করে চলেছিলেন। মামলায় গো-হারা হেরে অনুশোচনায় কাকাকে তিনি চিঠি লিখলেন :

শ্রীকৃষ্ণশরণং

সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দেব শর্ম্মণঃ প্রণামা পরার্দ্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্য অন্য লোকের কথা প্রমাণ মহাশয়ের নামে হিস্যা পাইবার প্রার্থনায় শুপরেম কোর্টে একুইটিতে অজথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে ও বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ